



## Pratidhwani the Echo

A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science

ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)

Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)

Volume-XII, Issue-II, January 2024, Page No.123-129

Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India

Website: <http://www.thecho.in>

### হাসান আজিজুল হকের ছোটগল্পে দেশভাগ: জলের কথা পানির কথা

শুভশ্রী দাস

স্টেট এডেড কলেজ টিচার, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, রাজা বীরেন্দ্র চন্দ্র কলেজ, কান্দি, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

#### Abstract:

*The partition in the middle of the 20th century left deep scars on the fabric of Bengali's life, echoing the broader social disaster that unfolded in India. The lasting impact on the lives of Bengalis reflects the profound consequences of the two-nation theory, tearing not just the nation but the very essence of humanity. The sense of being alienated in one's own land and the sorrow of forced emigration vividly encapsulate the frustration and grief experienced by the common people due to political decisions. . I have embodied the frustration, lamentation and grief In context of the Hasan azizul hoque's selected short stories of the common people due to emigration political decisions only. Hassan Azizul Hoque is the most important short story writer of Bengali literature in Bangladesh who in his texts selected the issues of refugee problems, social and economic decay of mankind, human brutality, riots and communal instability. The style which he adopted for his partition stories to delineate the pangs, sorrow and sufferings of partition coupled with post-partition condition sketches are irreparable and outstanding.*

**Keywords:** Partition, Two – Nation Theory, Emigration, Refugee, Social Disaster, Riots.

#### মূল প্রবন্ধ:

“তারপর, সমস্ত পথ একটাও কোনো কথা না বলে  
আমরা হাঁটতে থাকি, হেঁটে যেতে থাকি  
একদেশ থেকে অন্যদেশে  
এক ধর্ষণ থেকে আরো এক ধর্ষণের দিকে।”

বিশ শতকের মধ্যলগ্নে বাঙালি জীবনের এক কলঙ্কিত অধ্যায় দেশভাগ। সমগ্র ভারতবর্ষ তথা বাঙালির জীবনে এই দেশভাগ এক সামাজিক বিপর্যয় যার দগদগে ক্ষত বাঙালির শিরায় উপশিরায় আজও প্রবহমান। ধর্মের দোহাই দিয়ে গড়ে ওঠা দ্বি - জাতিতত্ত্বের অবশ্যস্বাবী ফল হিসেবে দেশভাগ শুধু দেশ নয়, আপামর মানবজাতির অস্তিত্বকেই দ্বি - খণ্ডিত বা বলা ভালো বহুখণ্ডিত করেছিল। বিপন্ন মানুষের রক্তক্ষরণ, সমাজের অসঙ্গতি, মানুষের অপ্রাপ্তি, বঞ্চনা, হতাশা এই সময়পর্বে যেভাবে প্রকটিত হয়েছিল তা এখনও অব্যাহত। একদিকে ছিন্নমূল হয়ে যাওয়ার যন্ত্রণা অন্যদিকে সামাজিক ও রাজনৈতিক অচলাবস্থা মানুষকে সম্পূর্ণভাবে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। মানুষের জীবনে এমন কিছু মুহূর্তের আবির্ভাব হয়, যে মুহূর্তগুলিকে শুধুমাত্র

‘আনন্দ-বেদনা’র মতো আপাত শূন্য অভিব্যক্তি দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। অখণ্ড ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ছিল এমনই এক মুহূর্ত। কোনো ঐতিহাসিক কাল স্বয়ংজাত নয়, পূর্বগামী কালধারার সঙ্গে তা সংযোগসূত্রে আবদ্ধ। অন্যান্য দেশের মতো ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। ঐতিহাসিক সময়সরণী অনুযায়ী বলা যেতে পারে - ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে নবাবের বিরুদ্ধে জয়লাভে হয় ইংরেজ রাজত্বের সূচনা। এই ১৭৫৭ সাল থেকে ১৮৫৭ (সিপাহী বিদ্রোহের শেষ) খ্রীঃ পর্যন্ত সময়কে বলা হয়েছে কোম্পানির আমল। তারপর ১৮৫৭, ১লা নভেম্বর থেকে ভারতবর্ষ হয় ব্রিটেনের মহারাণী ভিক্টোরিয়ার শাসনাধীন। এই শাসনকালের অবসান ঘটে ১৯৪৭ - এর ১৫ ই আগস্ট ভারতবর্ষের স্বাধীনতাপ্রাপ্তিতে। কিন্তু সেই স্বাধীনতার উচ্ছ্বাস বাঙালির মনে প্রবল হয়ে দেখা দেয়নি। এর প্রধান কারণ ১৯৪৬ সালে কলকাতার পথে পথে রক্তস্রোত ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। বাঙালি জাতির মন ও মননে বহু আকাজক্ষিত স্বাধীনতাপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে একাধারে হর্ষ ও বেদনা এবং আনন্দ ও হাহাকার দুটিই ছিল সমানমাত্রায়।

১৮৫৭ - ১৯৪৭ - ভারতবর্ষের এই পর্বের ইতিহাসে দুই বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত ও ভারতের ভূ-খণ্ডগত বিভাজন ভিন্নমাত্রা যোগ করেছিল বাংলা ও বাঙালির ইতিহাসে। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে দ্বিখণ্ডিত বাংলার ক্ষত প্রতিটি বাঙালির মনে দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়েছিল। এই সময়ে বাঙালির অস্তিত্ব সংকট এবং অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম তীব্র হয়ে উঠেছিল। যাকে আমরা বাঙালির অস্তিত্ব বা Individuality বলছি; বাঙালি আজ কোথায় দাঁড়িয়ে - সে যেখানেই দাঁড়িয়ে থাকুক না কেন, তার পিছনে দায়ী কিন্তু ইতিহাস। বাঙালির জীবন তথা ইতিহাসে যে তিনটি ওয়েভ এসেছিল; যে জাতি প্রায় পৌনে দু’শো বছর পরাধীনতার অভিশাপ বা আশীর্বাদ যাই বলা যায় না কেন, ভোগ করেছে অর্থাৎ যে জাতিটা বিশেষ করে ঔপনিবেশিক পরাধীনতায় দীর্ঘকাল পরাধীন থাকে তার মননশীলতা ও চেতনার মধ্যে দাসত্বের বোধটা গভীরভাবে শিকড় বিস্তার করে। স্বাধীনতা ও তার অব্যবহিতকালে দেশভাগ শুধুমাত্র ভূখণ্ডগত রাজনীতিকেই প্রভাবিত করেনি, করেছে জনজীবনকেও। সাম্প্রদায়িকতা ও সামাজিকতা মিলে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। ভারতবিভাজনের কুফল সবচেয়ে বেশি ভোগ করেছিল তিনটি ভূখণ্ডের মানুষ। পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ এবং পাঞ্জাব। বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ভারতবিভাগের ফলে স্বাধীনতার নামে নতুন জাতীয়তাবাদের আড়ালে জড়িয়ে পড়ে দুই বাংলার জনগণ। ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি রাষ্ট্র গঠিত হলেও বাংলা ও পাঞ্জাবের বিভক্তি ছিল এক বেদনাদায়ক অধ্যায়। দেশবিভাগের পরিণামী হিংসাকাণ্ড - হত্যা, রক্তপাত, লক্ষ লক্ষ মানুষের বাস্তুচ্যুতি আর শত শত নারীর লাঞ্ছনা নৃশংসতার দীর্ঘস্থায়ী ক্ষত রেখে গেছে হিন্দু - মুসলমান - দুই সম্প্রদায়ের জীবনে। লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন - “দেশবিভাগ এখন প্রতিষ্ঠিত সত্য, তবু বিচ্ছেদ, বেদনা আজও রয়ে গেছে। বাঙালি জাতি দ্বিখণ্ডিত হয়েছে কিন্তু সম্পূর্ণভাবে পৃথক হয়ে যায়নি... প্রত্যেক মানুষের মনের মধ্যে আজও অভ্যুত্থান ও পতনের পালা চলে।”<sup>২</sup>

ঘুম ভেঙে কিছু মানুষ আবিষ্কার করেছে যে, সে ‘নিজভূমে পরবাসী।’ ইতিহাসের অমোঘ নিয়তিকে স্বীকার করে স্বাধীনতার আবেগ, উচ্ছ্বাস এবং উচ্চশায় জনগণ এর জোড়ালো বিরোধিতা করেনি। শুধু রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের কারণে দেশত্যাগের ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে যে হতাশা ও বেদনা নেমে এসেছিল, পরবর্তীকালে এর দুঃখ - বেদনা মূর্ত হয়ে উঠেছিল তাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষণে, প্রতিটি অধ্যায়ে। জন্মভূমি ছেড়ে আসার ফলে বাঙালি জীবনের আঘাতের রক্তক্ষরণ, বেদনার আখ্যান নিয়ে ভারতবর্ষের সব ভাষাতেই লেখা হয়েছে। বাংলা সাহিত্য তার ব্যতিক্রম নয়। বাংলা সাহিত্যে দেশভাগ এবং তার পরিণামস্বরূপ স্ব-হারা, স্বজনহারা ছিন্নমূল মানুষদের নিয়ে একাধিক ছোটগল্প লেখা হয়েছে। সেই

অন্ধকারময় দিকগুলির কথা তুলে ধরেছেন বাংলা সাহিত্যের নানান খ্যাতনামা লেখক। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন হাসান আজিজুল হক, ওপার বাংলার কথাসাহিত্যিক। আমাদের এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় ‘হাসান আজিজুল হকের ছোটগল্পে দেশভাগ: জলের কথা পানির কথা।’ তাঁর ছোটগল্পের আখ্যানে যে দেশহারানো, বিপন্ন, ছিন্নমূল মানুষের কথা উঠে এসেছে তা বাহ্যিকভাবে সমগ্র বাঙালি জাতির কিন্তু আন্তরিকভাবে এপার বাংলা ও ওপার বাংলার ক্ষতবিক্ষত মানুষের তথা ‘জলের কথা পানির কথা’। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে মুক্তির জন্য রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম শেষপর্যন্ত পর্যবসিত হয়েছিল দাঙ্গা ও সাম্প্রদায়িকতা বীভৎসতায়। এই জলের কথা পানির কথা’ই যদি ধরা যায় তাহলে দেখা যাবে এই সাম্প্রদায়িকতাবাদ সুপ্তাবস্থায় বরাবরই ছিল। ব্রিটিশ রাজশক্তি অনুধাবন করেছিল, পরাজিত জাতিকে আজীবন পদানত করে রাখতে হলে এদের মাঝখানে নিজেদের প্রতিনিধি গড়ে তুলে শাসন তথা শোষণের প্রক্রিয়া সুসংহত হবে। তাই ইংরেজরা তাদের অনুসন্ধানী কূটকৌশলের দ্বারা হিন্দু - মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির তীব্রতাকে উপলব্ধি করে, তা উস্কে দিয়েছিল মাত্র। “... দেশভাগ হওয়ার সময় প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক শক্তি নানাভাবে এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি করল যে জনগণ বেশ কিছুদিনের জন্যে অন্ধতার মড়কে আক্রান্ত হয়েছিল। জনমত হয়ে উঠল দেশ - বিভাজনের পক্ষপাতী।” ও ভারতবর্ষে প্রধানত ধর্মীয় ও সামাজিক কারণে বিভেদের যে রাজনৈতিক বাতাবরণ আগে থেকেই তৈরি হয়েছিল; ইংরেজ সরকার সেটাকেই তাদের রাজনৈতিক সুবিধা ও সুযোগের হাতিয়ার হিসেবে ক্রমশ কাজে লাগিয়েছিল মাত্র। আসলে বলা ভালো হিন্দু ও মুসলমান - এই দুই সম্প্রদায়ের বিরোধ ও অবাঞ্ছিত সংগ্রাম ছিল ‘দেশভাগ’ ও ১৯৪৭ - এর দ্বিখণ্ডিত স্বাধীনতা প্রাপ্তির মূল কারণ।

হাসান আজিজুল হক নিজেই ছিলেন দেশহারানো মানুষ, দেশভাগের মানুষ। তিনি ছিলেন বৃহৎবঙ্গের মানুষ, ভাগ - বাটোয়ারা রাজনীতির শিকার। ধর্মের ভিত দিয়ে পৃথক করে দেওয়া এক অখণ্ড দেশ থেকে তিনি পাকিস্তানে এসেছিলেন; কিন্তু সত্যি সত্যি কি তিনি দেশের ঠিকানা পেয়েছিলেন? হাসান আজিজুল হক তাঁর রাঢ় বাংলার স্মৃতি আঁকড়ে রেখেছেন সারাজীবন। এই ফেলে আসা দেশ, ফেলে আসা স্মৃতি তাঁর লেখায় ফিরে এসেছে বারবার। দেশভাগ, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি - সংঘাত, পঞ্চাশের ভয়াবহ মন্বন্তর, বঙ্গসংকট, উদ্বাস্তু সমস্যা, ৭১ - এর মুক্তিযুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর ভয়াবহ বিধ্বংসী পরিস্থিতি, গণতন্ত্রের অপমৃত্যু, শোষণ শ্রেণির শাসন, শোষণ - এই সবই হাসান আজিজুল হকের কথাসাহিত্যের বিষয়। দেশবিভাগ নিয়ে রচিত তাঁর ছোটগল্পগুলি কালজয়ী সৃষ্টি। সমাজের ক্ষয়িত, নিপীড়িত মানুষ তাঁর গল্পভুবনের অনুষ্ণ। যেখানে দেশভাগের সক্রমণ পরিণামের পরিচয় ঘটে মাতৃভূমি থেকে বিতাড়নের নির্মম বেদনায়। ‘উত্তরবসন্তে’, ‘পরবাসী’, ‘মারী’, ‘ঘরগেরস্তি’, ‘আত্মজা ও একটি করবী গাছ’ - এই ছোটগল্পগুলি তারই স্বাক্ষর।

দেশভাগ - পরবর্তী মানুষের চূড়ান্ত পরিণতি ছিল শিকড়হীনতার যন্ত্রণা। জীবিকা ও জীবনের প্রয়োজনে বহু মানুষকে ফেলে আসতে হয় তার ভিটেমাটি। অনিচ্ছা সত্ত্বেও যাদের ত্যাগ করতে হয়েছিল শৈশবের মাতৃভূমি; তাদের যন্ত্রণার তল খুঁজে পাওয়া বা বলা ভালো সেই হৃদয়বিদারক অনুভূতি উপলব্ধি করা সহজ নয়। হাসান আজিজুল হক ছিলেন সেই পরিস্থিতির শিকার তাই তাঁর কথাসাহিত্য জুড়ে লিখতে পেরেছিলেন সেই যন্ত্রণার নিদারুণ কাহিনি। তাই তিনি বলেছেন - “দেশভাগ - দেশত্যাগে মানুষকে যখন হাজারে - হাজারে, লাখে - লাখে ভিটেমাটি থেকে উৎখাত হয়ে ছিন্নমূল উদ্বাস্তুতে পরিণত হতে হয়েছে - আমাদের সাম্প্রতিক ইতিহাসের বৃহত্তম বেদনা ও যন্ত্রণার কথা কেউ লেখেন নি।”<sup>৪</sup> হাসান আজিজুল হকের দেশভাগ ও

দাঙ্গা বিষয়ক গল্পগুলি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ, ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা - এই প্রত্যেকটি ঘটনা তাঁকে স্পর্শ করে গেছে। এই বেদনাময় স্মৃতি তাঁর শিল্পীসত্তায় সদা জাগ্রত। দেশভাগ ছিল লেখকের জীবনে ক্ষতস্বরূপ। আর এই ব্যক্তিক ক্ষতের কারণেই হয়তো লেখক বাস্তবচ্যুত মানুষের মর্মান্তিক যন্ত্রণা উপলব্ধি করতে পেরেছেন এবং দেশভাগের প্রকৃত চিত্রকে কথাসাহিত্যের বিষয় হিসেবে পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করেছেন। হাসান আজিজুল হকের গল্পে দেশভাগের কারণে উদ্বাস্ত বিপন্ন মানুষের করুণ আর্তনাদ ছত্রে ছত্রে উঠে এসেছে। সেই মানুষগুলো স্বপ্ন দেখতে পারে না। তারা শুধু নিজেদের জীবনের কথা বলে যায়। এই মানুষের একটিই পরিচয় - স্ব - হারা, স্বজন - হারা। ‘সমুদ্রের স্বপ্ন শীতের অরণ্য’ গল্পগ্রন্থের ‘উত্তরবসন্তে’ গল্পে গল্পকার দেখিয়েছেন দেশবিভাগের ফলে পশ্চিমবাংলার বর্ধমান থেকে বিনিময় ব্যবস্থার মাধ্যমে পূর্ববাংলায় চলে আসা একটি পরিবারের চিত্র। “... অতবড়ো বাড়িটা অন্ধকার। আর বাপ - মায়ের কাছে জীবনটা জীর্ণ ন্যাকড়ার মতো বাতাসে উড়ছে। কোন কিছুই তাঁদের পরিচিত আর প্রিয় নয়,... আমরা রিফুজি, উদ্বাস্ত।”<sup>৫</sup> বাণী এবং তার পরিবার ভিটেমাটি ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়েছে। তাদের জীবনে অপমৃত্যু ঘটেছে স্বপ্ন, আশা ও ভালোবাসার।

আসলে ভারতবিভাজনের ফলেই উদ্ভূত এই উদ্বাস্ত সমস্যা। ভারতভাগ এই উপমহাদেশের সবচেয়ে ট্রাজেডিময় অভিঘাত। এরই পরিণামস্বরূপ উদ্বাস্ত মানুষের হাহাকার। সেই হাহাকারের বেদনাদীর্ণ নীরব চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে ‘উত্তরবসন্তে’ গল্পে। গল্পকার বাণীর মুখ থেকে বলিয়েছেন - “আমরা সবাই অসুস্থ। আমাদের লোভী করতে নেই। আমাদের কোন অধিকার নেই জীবনে।”<sup>৬</sup> জীবন তাদের কাছে প্রাণহীন, গুরু ও মৃতপ্রায় - “বেঁচে থাকার যন্ত্রণাটা ভোগ করা ছাড়া তাঁর যেন বেঁচে থাকার আর কোনো উদ্দেশ্য নেই।”<sup>৭</sup> একদিকে স্বদেশ ছেড়ে আসার যন্ত্রণা অন্যদিকে বেঁচে থাকার সংগ্রাম, উদ্বাস্ত জীবনের সংকটের পরিচয় দিয়েছেন গল্পকার। ‘উত্তরবসন্তে’ গল্পটির সূচনা হয়েছে ‘অন্ধকার’ দিয়ে। এই অন্ধকার কখনোই দিনের অবসানে যে রাত নেমে আসে সেই রাতের অন্ধকার নয়; বরং বলা ভালো এই অন্ধকার হল রিফুজিদের অস্তিত্বহীনতার অন্ধকার, সবহারানোর অন্ধকার। এই দেশবিভাগ বাণী এবং তার পরিবারের কাছে ‘আলো’ হয়ে ওঠেনি। যা ছিল তাদের কাছে হতাশার অন্ধকার। বাণীর বাবা - মাকে দেখে যেন মনে হয় তাদের অন্ধকারের জীবন, তার মা কেবল প্রাণধারণের জন্য বেঁচে আছেন। এই হতাশাদীর্ণ ক্লান্ত জীবনের মধ্যে বাণীর সেই রাঢ়বাংলার পুরোনো জেলা শহরটার কথা মনে পড়ে। যা আজ অতীত - ‘সেই রোদ আর কোনোদিন দেখবে না বাণী।’<sup>৮</sup> কাঁটাতার পেরিয়ে বাণীরা যে নতুন দেশে আসে, সেই দেশ তাদের স্বচ্ছল জীবন উপহার দেয়নি বরং চরম অর্থনৈতিক দুরবস্থা, বিপর্যয় ও সামাজিক অচলাবস্থার মধ্যে দাঁড় করিয়েছিল। গল্পে সকালের জলখাবারের বর্ণনাতেই তাদের জীবনের এই নির্মম সত্য আরো বেশি করে প্রকটিত হয়ে ওঠে। তাই তাদের স্বপ্ন কোনোরকমে খেয়ে না থেকে বেঁচে থাকার। তাদের জীবনের অভিধানে ‘ভালোবাসা’ শব্দের কোনো স্থান নেই। এই নিষ্ঠুর সত্য তাদের অজানা নয়। তাই জীবনের চরম দারিদ্রতার সঙ্গে সংগ্রাম করতে করতে তারা স্বপ্ন দেখতেও ভুলে যায়। হাসান আজিজুল হকের গল্পে নিম্নবর্গের মানুষের কোনো স্বপ্ন নেই। তাঁর গল্পের নায়ক - নায়িকাদের সমাজ পরিবর্তনের জন্য বিপ্লবীর ভূমিকায় দেখা যায় না। তারা শুধু জীবনের গল্প বলে যায় বেঁচে থাকার এক অসম্ভব আকুতি নিয়ে। “দেশভাগ শুধু বাস্তব কেড়ে নেয়নি, দিয়েছে পারাপারহীন ও প্রতিকারশূন্য আত্মগানি। স্তব্ধ ঘরের ভেতর থেকে রুগ্ন গলায় বৃদ্ধের আর্তি ‘মহাপাপ করেছি জীবনে, মহাপাপ করেছি, আসলে কোনও একক বাচন নয়, তা ইতিহাসের নিষ্ঠুর অভিঘাতে অনিকেত হয়ে যাওয়া মানুষের সামূহিক বাচনেরই দৃষ্টান্ত।”<sup>৯</sup>

একশ্রেণির মানুষের কাছ থেকে ১৯৪৭, ‘স্বাধীনতা’ এবং স্বদেশ - এর এই পূর্ব (সম) পদ, (স্ব) কেড়ে নেয়। তাদের জন্য পড়ে থাকে কেবলমাত্র ‘অধীনতা’ এবং ‘দেশ’। সেই একশ্রেণির মানুষের কাছে ‘কোথায় সে দেশ? ভবিষ্যতে? অতীতে?’ কার কাছেই বা তারা তাদের অধীনোত্তর পুনর্জন্ম যাপন করবে? সেই উত্তর খুঁজতে খুঁজতে ‘কমল সাহা’ এবং ‘কামাল শেখ’ জনগণ থেকে হয়ে যায় জনসংখ্যায়। বধুনা ও মাতৃভূমি থেকে বিতাড়নের অসম্ভব বেদনা পরিলক্ষিত হয় হাসান আজিজুল হকের ‘আত্মজা ও একটি করবী গাছ’ গল্পগ্রন্থের ‘পরবাসী’ গল্পে ওয়াজদির কথায়। সে বশিরকে বলে - “তোমার বাপ কটো? এ্যাঁ - কটো বাপ? মা কটো? একটো তো? দ্যাশও তেমনি একটো।”<sup>১০</sup> ধর্মীয় উন্মাদনা ও দাঙ্গার রাজনীতিতে কীভাবে ধ্বংস হয় মানবিক সত্তা এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠে মানুষ তার চিত্র দেখতে পাই ‘পরবাসী’ গল্পে - “পাকিস্তানে হিন্দুদের লিঙ্ক একছাড় কাটচে - কলকাতায় তেমনি কাটচে মোসলমানদের।”<sup>১১</sup> মধ্যরাড়ের এক কৃষিনির্ভর গ্রামেও নারকীয় হত্যালীলার আশুভ ছড়িয়ে পড়ে। সে আশুভে দক্ষ হতে হয় বশিরের পরিবারকে। এদেশের আগত উদ্বাস্তুরা পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কাছে অবাঞ্ছিত বোঝাস্বরূপ হয়ে ওঠে। ‘দুই সম্প্রদায়ের বৃহৎ অংশ - যাঁরা পূর্ববঙ্গ অথবা পশ্চিমবঙ্গে বাস করতেন- প্রত্যক্ষভাবে দেশভাগের শিকার হয়েছেন, ভোগ - ভোগান্তির মোকাবিলা করেছেন পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দু সম্প্রদায়ের সেই অংশ - যাঁরা নিপীড়িত, বিতাড়িত, নিগৃহীত ও অপমানিত হয়ে দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন। একইভাবে পশ্চিমবঙ্গের যেসব মুসলিমকে দেশত্যাগ করতে হয়েছিল তাঁরাও যে বিভাজনের কুফল ভোগ করেছেন এব্যাপারেও বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।”<sup>১২</sup> যার পরিচয় পাওয়া যায় ‘মারী’ গল্পে - “যেহান ইচ্ছে সেহানে যাক, আমরা মরতিছি নিজেগো জ্বালায়; এ্যাহন রিফ্যুজি আলি বাঁচবে নে একডা লোক, কনদিনি”<sup>১৩</sup>

ভারতবর্ষের এই উদ্বাস্তু সমস্যাটি দীর্ঘদিনের সাম্প্রদায়িক বৈরিতার প্রতিফলন, যার প্রকাশ প্রত্যক্ষভাবে দেখা দিতে আরম্ভ করে ১৯০৫ খ্রিঃ থেকেই। ১৯৪৬ - ৪৭ - এ তা ব্যাপক আকার ধারণ করে। স্বাধীনতার দু-তিন বছর পর যেসব হিন্দু পিতৃপুরুষের দেশত্যাগ না করার ইচ্ছে নিয়ে পূর্ববঙ্গে থাকার চেষ্টা করেছিলেন, ১৯৫০ নাগাদ তা আর তাঁরা পারেননি। এই সময়ে পূর্বপাকিস্তানে সুপারিকল্পিতভাবে হত্যা, সম্পদ - লুণ্ঠন, ধর্ষণ প্রভৃতি চলতেই থাকে। পঞ্চাশ সালের যে উদ্বাস্তু সমস্যা শুরু হয়েছিল যার ফলস্বরূপ ঘরছাড়ারা ঘর পায়নি, খাদ্য পরিস্থিতির অচলাবস্থা সেই সময় থেকে তীব্র আকার ধারণ করে। যার প্রতিচ্ছবি আমরা দেখতে পাই হাসান আজিজুল হকের ‘ঘরগেরস্তি’ গল্পে। রাগে ঘৃণায় রামশরণের গলার আওয়াজ চিড় খেয়ে বেড়িয়ে আসে - “স্বাধীন হইছি আমরা -... গতবছর পরাণের ভয়ে পালালাম ইন্ডেয় - নটা মাস শ্যাল কুকুরের মতো কাটিয়ে ফিরে আলাম স্বাধীন দেশে। আবার সেই শ্যাল কুকুরের ব্যাপার। ছোওয়াল মিয়ের হাত ধরে আজ ইন্টিশান, কাল কলেজঘাট - স্বাধীনটা কি আঁ? আমি খাতি পালাম না - ছোওয়াল মিয়া শুকিয়ে মরে, স্বাধীনটা কোঁয়ানে? রিলিফের লাইনে দাঁড়াও ফহিরের মতো - ভিক্ষে করো লোকের বাড়ি বাড়ি।”<sup>১৪</sup>

সেই সময়কার ভয়াবহ পরিস্থিতি সম্পর্কে সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, “নির্যাতনের নিষ্ঠুরতা ছিল অকল্পনীয়। এক সম্প্রদায়ের উদ্বাস্তু আরেক সম্প্রদায়ের উদ্বাস্তুকে আক্রমণ করেছে - নারী লুণ্ঠন হয়েছে নির্বিচারে, কোলে - শিশু জননীও রেহাই পাননি সেই উন্মত্ত পাশবতার আক্রমণ থেকে।... অনেক অশ্রু - রক্তের বিনিময়ে পাওয়া স্বাধীনতা ক্রমশই বিস্বাদ হয়ে যাচ্ছিল মানুষের কাছে। স্বাধীনতা এসেছে, দেশভাগ হয়েছে, অথচ দাঙ্গা - রক্তপাতের বিরাম নেই।”<sup>১৫</sup> দেশভাগের ফলস্বরূপ ‘নৃশংস আত্মবিচ্ছেদের ট্রাজেডি’

যে বাঙালির জীবনে এসেছিল তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল হাসান আজিজুল হকের “আত্মজা ও একটি করবী গাছ” গল্পটি। দেশভাগ - পরবর্তী কোনো এক সময়ের ঘটনা এই গল্পের পটভূমি। এই গল্পের বাস্তবভিত্তিক প্রবীণ যেন ভিতরে - বাইরে আত্মদ্বন্দ্বের পরাভূত এক মহান ট্রাজেডির নায়ক। দেশভাগের পর সমস্ত খুইয়ে সপরিবারে তারা আশ্রয় নিয়েছেন এক গ্রামে। গল্পে এই প্রবীণের মুখে শোনা যায় - “দেশ ছেড়েছে যে তার ভেতর বাইরে নেই। সব এক হয়ে গেছে।”<sup>১৬</sup> দেশবিভাগের পর সেই বৃদ্ধের পরিবার মাথা গোঁজার একটা জায়গা পেলেও পেটের জ্বালা জুড়োবে কীভাবে? তাই বৃদ্ধকেও নতুন রোজগারের পথ খুঁজে নিতে হয় কারণ ক্ষুধার চেয়ে বড় আর কী? দেশভাগ- পরবর্তী উদ্বাস্তু জীবনের সামাজিক পরিচয় তীব্র ভাঙনের মুখে যখন এসে দাঁড়ায় তখন পিতাকে তার আত্মজাকে পন্য করে তুলতে হয়। গল্পের শুরুতেই শিয়ালের মুখে মুরগির চিত্রকল্প যেন সেই গ্রামের চরিত্রদের মানুষের সামনে তুলে ধরে। লেখক সমগ্র গল্পে সময়ের এই সতত নিষ্ঠুর বাস্তবতাকেই নির্মোহভাবে এঁকেছেন। উদ্বাস্তুদের পরাস্ত জীবন তাই লেখকের কাছে শুধু সরকারি হিসেব হয়ে থাকে না, হয়ে ওঠে সময়ের মুখ।

সামগ্রিক আলোচনার শেষে তাই বলতে হয়, দেশবিভাগের পরিণাম ছিল দেশত্যাগ; যার পরিণতি উদ্বাস্তু সমস্যা। এঁদের নাম নেই, বাসস্থান নেই, অভিভাবক নেই হয়তো ঈশ্বরও নেই। জীবনের একমাত্র সত্য শুধু কাঁটাতার। যা তাঁকে নাম দিয়েছে - উদ্বাস্তু, রেফিউজি, কাঁটাতার - পেরোনো, আল-টপকানো। ছিন্নমূল এই মানুষগুলোর হারিয়ে গেল অতীত এবং ভবিষ্যত হয়ে গেল অনিশ্চিত। বাঙালি মুসলমানকে আবার সংগ্রাম করতে হয়েছে স্বাধীনতার জন্য, যারা পশ্চিম পাকিস্তানের শোষকশ্রেণির হাতে নৃশংসভাবে শোষিত, অত্যাচারিত। হিন্দুদের উপলব্ধি করতে হয়েছে রেডফ্লিক লাইন টেনে দিলেই সমস্যার সমাধান হয় না। দেশভাগ শুধু ভূখণ্ডগত বিভাজন নয়, তা সাংস্কৃতিক, সাম্প্রদায়িক বিভাজনও। যার ফলে এক উঠোনের দুই পড়শি আলাদা হয়ে গেছে। সর্বগ্রাসী ভাঙনের শিকার তথা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মানুষ কারণ পাকিস্তানে যাহা জল তাহা পানি।

### তথ্যসূত্র:

- 1) ঘোষ, শঙ্খ, শ্রেষ্ঠ কবিতা, এপ্রিল ১৯৭০, কলিকাতা : দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ১৮৬
- 2) গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, পূর্ব পশ্চিম, সেপ্টেম্বর ২০১৯, কলিকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ব্যাক কভারে দেওয়া মন্তব্য।

- 3) ভট্টাচার্য, তপোধীর, কথাপরিসর বাংলাদেশ, ডিসেম্বর ২০১৭ , কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, পৃ. ১৬৯
- 4) সিকদার, অশ্রুকুমার, ভাঙা বাংলা ও বাংলা সাহিত্য, ২০০৫ , কলকাতা :দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ২১
- 5) হক, হাসান আজিজুল, গল্পসমগ্র (প্রথম খণ্ড), উত্তরবঙ্গ, অক্টোবর ২০০৩, কলকাতা: নয়া উদ্যোগ, পৃ. ৪০
- 6) তদেব, পৃ. ৪৩
- 7) তদেব, পৃ. ৩৫
- 8) তদেব, পৃ. ৩৮
- 9) ভট্টাচার্য, তপোধীর, কথাপরিসর বাংলাদেশ, ডিসেম্বর ২০১৭, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ১৭২
- 10) হক, হাসান আজিজুল, গল্পসমগ্র (প্রথম খণ্ড), পরবাসী, অক্টোবর ২০০৩, কলকাতা: নয়া উদ্যোগ, পৃ. ১২৮
- 11) তদেব, পৃ. ১২৭
- 12) ভট্টাচার্য, তপোধীর, কথাপরিসর বাংলাদেশ, ডিসেম্বর ২০১৭ , কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, পৃ. ১৬৯
- 13) হক, হাসান আজিজুল, গল্পসমগ্র (প্রথম খণ্ড), মারী, অক্টোবর ২০০৩ , কলকাতা: নয়া উদ্যোগ পৃ. ১৪৫
- 14) হক, হাসান আজিজুল, গল্পসমগ্র (প্রথম খণ্ড), ঘরগেরস্তি, অক্টোবর ২০০৩, কলকাতা : নয়া উদ্যোগ পৃ. ৩১৯
- 15) বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপ, দেশভাগ - দেশত্যাগ, ১৯৯৪, কলকাতা : অনুষ্টুপ, পৃ. ৪১
- 16) হক, হাসান আজিজুল, গল্পসমগ্র (প্রথম খণ্ড), মারী, অক্টোবর ২০০৩ , কলকাতা : নয়া উদ্যোগ পৃ. ১১৮

### গ্রন্থপঞ্জী:

- 1) হক, হাসান আজিজুল, গল্পসমগ্র (প্রথম খণ্ড), অক্টোবর ২০০৩ , কলকাতা : নয়া উদ্যোগ।
- 2) ভট্টাচার্য, তপোধীর, কথাপরিসর বাংলাদেশ, ডিসেম্বর ২০১৭ , কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং ।